কবিরাজের বিপদ

(গল্পগ্রন্থ – ছায়াছবি)

চন্দ্রনাথবাবু কবিরাজ এবং শিশির সেন তরুণ ডাক্তার। রামদাসের ছোট্ট বাজার পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু ডাক্তার, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। রোগীর চেয়ে ডাক্তারের সংখ্যা বেশি। তবে দেশটায় রোগ-বালাই নিতান্ত কমও নয়, তাই সবাই দু-মুঠো ভাতের জোগাড় করতে পারত কোনোরকমে। চন্দ্রনাথবাবুর বয়েস পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন, শিশির সেনের বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশ। ওদের ডাক্তারখানা রাস্তার এপার-ওপার। রোগীপত্তর প্রায়ই থাকে না, দু-জনে বসে গল্পসল্প করে। বয়সের তারতম্য যতই থাকুক, দু-জনে খুব বন্ধুত্ব। চন্দ্রনাথবাবু এসেচেন খুলনা জেলার হলদিবুনিয়া থেকে আর শিশিরবাবু যশোর শহর থেকে।

কাজকর্ম না থাকলে যা হয়ে থাকে, দু-জনে বসলেই তর্ক আর দ্বন্দ্ব। তর্কের বিষয়বস্তু প্রধানত মানুষের মৃত্যুর পর কি হয়, এই নিয়ে।

চন্দ্রনাথবাবু বলেন—তাঁদের গ্রামের একজন সাধু ছিলেন, তিনি ভূত নামাতেও পারতেন। অনেকবার তিনি ভূতনামানো চক্রে উপস্থিত ছিলেন, নিজের চোখে ভূতের আবির্ভাব দেখেচেন, ভূতের কথা শুনেচেন নিজের কানে। সাধুটি একজন বড় মিডিয়ম, তাঁর মধ্যে নাকি ভূতের দল পৃথিবীতে নিজেদের প্রকাশ করে।

শিশির সেন বলল—রাবিশ !

চন্দ্রনাথবাবু বলেন—তোমার বলবার কোনো অধিকারই নেই এখানে ! তুমি ছেলেমানুষ, কতটুকু তোমার অভিজ্ঞতা ?

—অভিজ্ঞতার কোনো দরকার হয় না, কমন-সেন্সের প্রশ্ন এটা।

—কাকে বলচো কমন-সেন্স ?

—মানুষ মরে গেলে আর বেঁচে থাকে না, কমন-সেন্স। মরা মানেই না-বাঁচা।

—মরা মানে বৃহত্তর জীবনের মধ্যে প্রবেশ করা।

—মরা মানেই না-বাঁচা !

—মরা মানে জীবনটা বড় করে পাওয়া।

—একদম বাজে।

—দু-পাতা সায়েন্স পড়ে ভাবচো খুব সায়েন্স শিখে ফেলেচো ?আসল সায়েন্সের কিছুই জানো না, শেখোনি।

বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহ। এ বছরের মতো এমন গরম এখানকার বৃদ্ধ লোকেরাও সেখানে কোনোদিন দেখেনি।

শিশির সেন বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় এসে ডাক্তারখানা খুললেন। নাঃ, টিনের বারান্দা তেতে আগুন হয়েচে, এখনো ঘরের ভেতর বসা সম্ভব নয়।

সামনের পানের দোকানীকে বললেন—রাস্তাটাতে একটু জল ছিটিয়ে দিয়ো অভয়— এখুনি লরি গেলে ধুলোয় চারিদিকে অন্ধকার করে দেবে।

—ও কোবরেজ মশায় !

—কি ?

—বাইরে আসুন না।

—যাই।

—কতক্ষণ এলেন ?

—আমি আজ বাসায় যাই নি—দুপুরে এখানেই শুয়েছিলাম।

—খেলেন কোথায় ?

—রামজীবন তরফদারের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ গেল আজ কিনা। নেমন্তন্ন ছিল।

—হুঁ। আসুন আমার বারান্দায়, চা খাবেন ?

—না মশায়। এই গরমে চা ?দুপুরে লুচি ঠেসে ?

—দালদা ঘি-এর তো ?

—নইলে আর কোথায় পাচ্চে গাওয়া ঘি ?

—না মশাই, ও নেমন্তন্ন না খেয়ে ভালোই করেচি। খেলে অম্বল, না হয় পেটের অসুখ ?আর এই গরমে !

চন্দ্রনাথবাবু ডাক্তার সেনের বারান্দায় এসে বসলেন এবং চাও খেলেন। পরে যথারীতি ভূতের গল্প শুরু হয়ে গেল।

চন্দ্রনাথবাবুর মধ্যে একটু সময়পটু আত্মা বাস করে, অবিশ্বাসীর সঙ্গে যুদ্ধ করেই তার তৃপ্তি। শিশির সেন ভূতে বিশ্বাস করুক না করুক, তাতে চন্দ্রনাথ কবিরাজের কি ?জিনিসটা যদি সত্যিই হয়, তবে শিশির সেনের অবিশ্বাস সেটার কি হানি করতে পারে ?

চন্দ্রনাথবাবু সেটা বোঝেন না যে এমন নয়, বোঝেন সবই। তবু যদি একজন অবিশ্বাসীকেও একদিন আলোতে এনে হাজির করা যায় ! ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের দিগ্বিজয়ী প্রচারকদের আশা যেন তাঁর মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে। সত্যের আলোতে এসব অসৎ মূর্খ ছেলে-ছোকরাদের আনতেই হবে, তবেই প্রকৃত শান্তি দেওয়া হবে এই দাম্ভিকদের। স্বার্থবাদী ছোকরা দাম্ভিকের দল ! দু-পাতা সায়েন্স পড়ে সব শিখে ফেলেচে।

চন্দ্রনাথবাবু জানতেন না শিশির সেনের মতো ছোকরা তাঁর সম্বন্ধে কি মনে করে ?ওরা আড়ালে মুখ টিপে হেসে বলে—বুড়ো একদম সেকেলে। কুসংস্কারে ভরা। ইংরাজি তো তেমন জানে না। কবরেজি করত, সংস্কৃত জানে একটু-আধটু। দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে ঊনবিংশ শতাব্দীর। কি করি, মেশবার কোনো লোক নেই এসব জায়গায়। কার সঙ্গে দুটো কথা বলি, নইলে ওই বুড়োহাবড়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার ?রামঃ !

একটু পরেই হঠাৎ পশ্চিম দিগন্তে অন্ধকার করে একখানা বড় কালো মেঘ উঠল এবং কিছুক্ষণ পরে কালবৈশাখীর ঝড় শুরু হয়ে গেল। চন্দ্রনাথ কবিরাজ নিজের কবরেজখানার জানলাদরজা বন্ধ করতে ছুটে গেলেন। ধুলোয় চারিদিক অন্ধকার হয়ে উঠল, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু হল বটে কিন্তু বৃষ্টি বেশি না হয়ে ঝড়টাই হল বেশি।

ডাক্তারখানার সামনের অশ্বত্থ গাছের একটা ডাল ভেঙে উড়ে এসে পড়ল শিশির সেনের ডাক্তারখানার দরজার সামনে। বৃষ্টি-ভেজা সোঁদা মাটির গন্ধ বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস ঠাণ্ডা—গরম একদম কমে এল।

চন্দ্রনাথ বললেন—আঃ, বাঁচা গেল ! শরীর জুড়িয়ে গেল যেন ! কতদিন পরে একটু বৃষ্টি পড়ল আজ মাটিতে !

—চা খাবেন একটু ?

তা হলে মন্দ হয় না। আনাও আর একটু।

এই সময় বৃষ্টিটা বেশ জোরেই এল। বর্ষাকালের বৃষ্টির মতো।

চন্দ্রনাথ কবিরাজের কবরেজখানার ঘরের চালের ছাঁচ বেয়ে অবিরলধারে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। রাস্তায় জল জমে উঠল আধ-ঘণ্টার ভেতর।

—বেশ বৃষ্টি হল, মুষলধারে না হলেও এ বছরের পক্ষে মন্দ নয়। চন্দ্রনাথবাবু বললেন—কই, তোমার চা কোথায় গেল হে ?

নবীন তো গিয়েচে, বৃষ্টি আটকে পড়ল রামুর দোকানে। ছাতি আছে আপনার ?

—নাঃ।

তবে আর কি হবে ?বসুন, জল ছেড়ে যাক। আপনার ভূতুড়ে আলোচনা আরম্ভ করুননা !

—নাঃ।

—কেন, আজ এত বিরাগ কেন ?আজই বরং ঠাণ্ডা বাদলার সন্ধেতে ও-কথা জমবে ভালো।

—না হে, তোমরা অবিশ্বাস করো হাসাহাসি করো, গভীর সত্যকে এভাবে বেনা-বনে ছড়াতে নেই।

—আপনার কথার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হতে হচ্চে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে। গভীর সত্য কাকেবলছেন আপনি ?

—মানুষের জীবন ও মৃত্যু অদ্ভুত রহস্যময়। গভীর রহস্য দিয়ে ঘেরা আমাদের এই জীবন। মানুষ মরে না। ভগবান অনন্ত করুণার আকর, এই হল গভীর সত্য। আরো সংক্ষেপে শুনতে চাও ?মানুষ অমর।

শিশির সেন হেসে বলে উঠলেন—তবে আপনি কবরেজি করেন কেন ?মানুষ যদি অমর তবে ?

—তার এই দেহটা অমর নয়, তাই কবিরাজি করি। আর এতদিন পরে কথাটা বলি, কবিরাজি করতে গিয়েই এই সত্যটা টেরও পেয়েচি।

—কি ভাবে ?

এই সময় নবীন চাকর ভিজতে ভিজতে চা নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখলে।

শিশির সেন বললেন—বিস্কুট কই রে ?আনিসনি ?যা নিয়ে আয় চারখানা।

—আর শোন, দুটো সিগারেট নিয়ে আয় অমনি। এইবার বলুন কি ভাবে ?

চন্দ্রনাথ কবিরাজ চা খেতে খেতে গম্ভীর মুখে বললেন—নাঃ, ও সব নিয়ে ঠাট্টা নয়। বাদ দাও।

—না না, রাগ করবেন না। কি করে সত্যটা টের পেলেন কবরেজি করতে গিয়ে বলুন না ?বেশ বাদলার সন্ধেটা—

—না, আমি বলব না। ঠাট্টার ব্যাপার নয় সেটা। তোমরা হাসবে আর আমি ভেবেচ আমার জীবনের অত বড় একটা অভিজ্ঞতা—

—আমি কবে আপনাকে ঠাট্টা করেছি এ নিয়ে ?সত্যি বলুন !

চন্দ্রনাথ কবিরাজের মনটা যেন একটু নরম হয়ে এল। তিনি চা খেতে খেতে শুরু করলেন নিম্নের গল্পটি।

—আমি নিজে যা দেখেচি তা অবিশ্বাস করি কি করে ?ঘটনাটা গোড়া থেকে বলি। পাকিস্তানে আমার বাড়ি ছিল, খুলনা জেলার হলদিবুনিয়া গ্রামে। আমার বাবার নাম ছিল ৺ত্রিপুরাচরণ শাস্ত্রী, সেকালের বড় নামডাকওয়ালা কবিরাজ ছিলেন তিনি।

বাবা বড় কবিরাজ ছিলেন, তাঁর পসার পেলাম আমি। বাবা তখনো বেঁচেই আছেন, তবে কাজকর্ম করেন না। ইদানীং পক্ষাঘাত রোগে এক দিকের অঙ্গ অচল হয়ে গিয়ে শয্যাগত ছিলেন একেবারে। নাম-করা সেকেলে কবিরাজের ছেলে হিসেবে বড় বড় বাঁধা ঘর ছিল, যারা অসুখ-বিসুখে আমাকে ছাড়া আর কোনো চিকিৎসককে ডাকত না।

মালমাজীর পাকড়াশী জমিদার ছিলেন এমন একটি বাঁধা ঘর। সেবার কার্তিক মাসের শেষে জমিদার হরিচরণ পাকড়াশী ডেকে পাঠালেন—তাঁর ছেলের অসুখ।

আমি গিয়ে দেখলাম ছেলেটির বিষম জ্বর, যাকে আপনারা বলেন টাইফয়েড। পনেরো-ষোলো বছর বয়েসটা ও রোগের পক্ষে তত সুবিধাজনক নয়। আমাকে জমিদারবাবু হাতে ধরে অনুরোধ করে বললেন—আপনাকে এখানে থাকতে হবে কবিরাজ মশায়, যা লাগে আমি তাই আপনাকে দেব। ছেলেকে বাঁচিয়ে দিন।

আমি রোগীর অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। পেট-ফাঁপা, বুকে সর্দি-কাশি, নাড়ির গতি আপনারা যাকে বলেন ইন্টারমিটেন্ট, ভুল বকা—সব খারাপ লক্ষণই বর্তমান। বাঁচানো বড়ই কঠিন।

ভগবান ধন্বন্তরীকে স্মরণ করে কাজে লেগে গেলাম। সেদিন সন্ধ্যার পর নাড়ির অবস্থাটা ভালো করে আনলাম। পেট-ফাঁপাও অনেকটা কমে গেল। ভুল বকুনি খানিকটা কমল। আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করতে গেলাম রাত্রি এক প্রহরের পর।

পাকড়াশী জমিদারের বাড়ি দো-মহলা। বাইরে একদিকে দোলমঞ্চ, নাটমন্দির আর গোবিন্দ-মন্দির। ডাইনে সদর-কাছারি আর মহাফেজখানা। মহাফেজখানার দক্ষিণে আমলাদের থাকবার কুঠুরি সারি সারি অনেকগুলি। আমলাদের বাসার পূর্বদিকে বড় পুকুর। এই পুকুরের তিন দিকে বাঁধানো ঘাট। পুব পাড়ের ঘাট বাইরের লোকদের জন্যে, বাকি দুটি ঘাট আমলাদের জন্যে।

বাইরের মহলের মাঝখানে সদর দেউড়ি, এই দেউড়ির দু-পাশে দুই বৈঠকখানা।

আমার বাসা নির্দিষ্ট হয়েছিল বাঁদিকের বৈঠকখানার পাশের বড় কুঠুরিতে।

সাদা ধবধবে চাদর পাতা, দুটো বড় তাকিয়া, মশারি খাটানো, চমৎকার বিছানা করে দিয়ে গিয়েছে বাড়ির ঝি। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমি বাইরে বসে অনেকক্ষণ রোগীর বিষয় চিন্তা করলাম, কাল সকালে কি কি অনুপান দরকার হবে, সেগুলো মনে মনে ঠিক করে রাখলাম। তারপর এসে শুয়ে পড়তে যাব, এমন সময়ে দেখি জ্যোৎস্নালোকিত মাঠ দিয়ে কে একজন সাদা-কাপড়-পরা স্ত্রীলোক এদিকে আসচে।

রাত তখন অনেক। এত রাতে একা কে মেয়ে এদিকে আসচে বুঝতে পারলাম না। মেয়েটি এসে দেউড়ি দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আবার সে বার হয়ে মাঠের দিকে চলে গেল। আমি ভাবলাম, আমলাদের বাড়ি থেকে যদি কোনো স্ত্রীলোক রোগীকে দেখতে আসে, তবে এত রাত্রে আসবে কেন ?একাই বা আসবে কেন ?...ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল দেউড়িতে।

এমন সময়ে বাড়ির ভেতর থেকে আমার ডাক এল—রোগীর অবস্থা খারাপ, শিগগির যেন যাই।

আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম রোগীর শয্যার পাশে।

সত্যি, রোগীর অবস্থা এত খারাপ হল কি করে ?দেড় ঘণ্টা আগেও দেখে গিয়েচি রোগীবেশ আরামে ঘুমুচ্চে, এখন তার জ্বর বড্ড নেমে গিয়েচে, অথচ চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল, নাড়ির অবস্থা খারাপ। জ্বর এত কম দেখে ঘাবড়ে গেলাম। বেজায় ঘামতে শুরু করেচে রোগী। মস্ত বড় সঙ্কটজনক অবস্থার মুখে এসে পড়ল কেন এভাবে হঠাৎ ?

তক্ষুনি কাজে লেগে যাই। আমিও ত্রিপুরা কবিরাজের ছেলে, উপযুক্ত গুরুর শিষ্য, দমবার পাত্র নই।

ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে রোগীকে চাঙ্গা করে তুলে শেষরাত্রে ক্লান্তদেহে বাইরের ঘরে বিশ্রাম করতে গেলাম।

এক ঘুমে একেবারে বেলা আটটা। উঠে রোগী দেখে এলাম, বেশ অবস্থা, কোনো খারাপ উপসর্গ নেই।

সারাদিন একভাবেই কাটল। রোগীর অবস্থা দেখে বাড়ির সকলে খুব খুশি। আমার সারাদিনের মধ্যে বিশেষ কোনো খাটুনি নেই। দুপুরবেলা খুব ঘুম দিলাম। বিকেলে—এমন কি বড় পুকুরে মাছ ধরতে গেলাম আমলাদের মধ্যে একজন ভালো বর্শেলের সঙ্গে। সেরখানেক একটা পোনা মাছও ধরলাম। মনে খুব ফুর্তি।

সেদিন রাত্রে বাইরের ঘরে শুয়ে আছি, এমন সময়ে দেখি দূরে মাঠের দিক থেকে যেন সেই স্ত্রীলোকটি এদিকে আসচে।

আজ সারাদিনের মধ্যে মেয়েটির কথা একবারও আমার মনে হয়নি। এসব আবার তাকে আসতে দেখে ভাবলাম ইনি নিশ্চয় এদের কোনো আত্মীয় হবেন, দূর গ্রাম থেকে দেখতে আসেন ঘরের কাজকর্ম সেরে। কিন্তু একা আসেন কেন ?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, কাল এই মেয়েটি রোগীকে দেখে চলে যাবার পরেই রোগীর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনটা যেন খারাপ হয়ে গেল।

মেয়েটি দেউড়ি দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকল দেখে আমার বুকের মধ্যেটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল কেন কি জানি। কান খাড়া করে রইলাম বাড়ির দিকে।

আরামে ঘুমুতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বিছানা ছেড়ে চেয়ারে বসলাম। ঘড়িতে ঠিক সে সময় বারোটা বাজল।

হঠাৎ দরজার কাছে কি শব্দ হল। মুখ তুলে দেখি, সেই স্ত্রীলোকটি একেবারে আমার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েচেন।

বেশ সুন্দরী, ধপধপে শাড়ি পরা, চল্লিশের মধ্যে বয়েস, কপালে সিঁদুর।

আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুবার আগেই তিনি আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে হুকুমের সুরে বলতে আরম্ভ করলেন—শোনো, তুমি এই ছেলেটিকে বাঁচাতে পারবে না, তুমি বাড়ি যাও।

আমার মুখ দিয়ে অতি কষ্টে বেরুলো—কেন মা ?আপনি কে ?

আমার শরীর যেন কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। সমস্ত ঘরটা যেন ঘুরচে। কেন এমন হল হঠাৎ কি জানি !

তিনি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে বললেন—শোনো, আগুন নিয়ে খেলা কোরো না। একে আমি নিয়ে যাব। এ আমার ছেলে। ওর বাবা আবার বিয়ে করেচেন আমার মৃত্যুর পর। সৎমা ওকে দেখতে পারে না। বহু অপমান হেনস্থা করে। আমি সব দেখতে পাই। আমার স্বামী অনেক কথা জানেন না, কিন্তু আমি সব জানি। আমি আমার ছেলেকে নিশ্চয় নিয়ে যাব। কাল রাত্রেই নিয়ে যেতাম, তোমার জন্য পারিনি। তুমি চলে যাও এখান থেকে। ওকে বাঁচাতে পারবে না।

আমার সাহস ফিরে এল।

হাতজোড় করে বললাম—মা, আমি বৈদ্য। আমার ধর্ম প্রাণ বাঁচানো। আমার ধর্ম থেকেআমি বিচ্যুত হব না কখনোই। আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার। একটা প্রস্তাব আমি করি মা। জমিদারবাবুকে সব খুলে বলি। অসুখ সারবার পরে তিনি ছেলেকে যাতে কোনো ভালো স্কুলের বোর্ডিং-এ রেখে দ্যান, এ ব্যবস্থা আমি করব। এ যাত্রা আপনি ওকে নিয়ে যাবেন না। যদি আবার ওর ওপর অত্যাচার হতে দ্যাখেন, তখন নিয়ে যাবেন আর আমিও আসব না। দয়া করুন জমিদারবাবুকে। তিনি বড় ভালোবাসেন এই ছেলেকে।

তিনি বললেন—বেশ তাই হবে। তবে যদি কোনো ভালো ব্যবস্থা না হয়, তবে সেবার আমি ওকে নিয়ে যাবোই, মনে থাকে যেন।

তখনই যেন সে মূর্তি মিলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ডাক এল ওঘর থেকে, রোগীর অবস্থা খারাপ।

আমি তখনি ছুটে গেলাম। কাল যেমন অবস্থা ছিল, আজও ঠিক তাই। বরং একটু বেশি খারাপ। ভোর পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হল রোগীকে চাঙ্গা করতে।

সকালবেলা বাইরে যাওয়ার আগে জমিদারবাবুকে আমি নিভৃতে ডেকে বললাম—কিছু মনে করবেন না জমিদারবাবু, আপনি এই ছেলেটিকে বাঁচাতে চান তো ?

জমিদারবাবু অবাক হয়ে বললেন—তার মানে ?

—তার মানে হচ্চে এই, আপনি জানেন না ওই ছেলেটির ওপর ওর সৎমা বড় অবিচার করেন। কাল ওর মা আমার কাছে এসেছিলেন—শুনুন তবে।

সব কথা খুলে বললাম। জমিদারবাবু প্রথমটা অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেললেন।

পরে বললেন—আমি কিছু কিছু জানি। বেশ এবার ও বেঁচে উঠুক, এর ব্যবস্থা আমি করব, আপনাকে আমি কথা দিলাম। ও সেরে উঠুক, জানুয়ারি মাস থেকে যশোর জেলাস্কুলের বোর্ডিং-এ ওকে আমি রাখব।

—কেমন ঠিক তো ?এবার কিছু হলে আমি কেন, কেউ আর ওকে বাঁচাতে পারব না।

—আমি কথা দিচ্চি কবরেজ মশাই।

—বেশ। নির্ভয়ে থাকুন, আপনার ছেলে সেরে গিয়েচে। আগামী মঙ্গলবার ওকে পথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করব। আপনি পুরনো চাল কিছু এর মধ্যে জোগাড় করুন।

পরের দিন জ্বরছেড়ে গেল রোগীর।

শিশির সেন একমনে গল্প শুনছিলেন।

বললেন—সেরে উঠল।

—নিশ্চয়।

—আর কোনোদিন দেখেছিলেন তার মাকে ?

—কোনদিন না। সে ছেলে এখন কলকাতায় থাকে, কিসের ভালো ব্যবসা করে শুনেচি। জমিদারবাবু মারা গিয়েচেন। চললুম আমি, বৃষ্টি থেমেচে—ঘরে আলো জ্বালি গে।

চন্দ্রনাথ কবিরাজ উঠে চলে গেলেন।